CC-2. Indian Sociology. 2nd Sem. (G). S.P.

সূচনা : ধর্মের বিকাশের ধারা প্রবাহে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাজনীতির অস্তিত্বের সূচনা ঘটে।

ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাজনীতিই হল **ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি (Secular Politics)**। রাষ্ট্রীয় রাজনীতি যখন ধর্ম ও ধর্মীয় বিধান এবং ঈশ্বরীয় আদেশ-নির্দেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সত্তা লাভ করে, তখনই তাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বলা হয়ে থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংযোগ থাকে না।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির উদ্ভবের উৎস হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতিকে চিহ্নিত করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির পথ ধরে গ্রাম-সমাজের অবসান ঘটতে থাকে এবং উত্তরোত্তর শহুরে সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। এই শহুরে সমাজে শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। এই শিল্পায়িত, বিদ্যুদয়িত, আধুনিকীকৃত এবং নগরায়িত সমাজে মানুষের জীবনের উপর ধর্মের এতকালের চূড়ান্ত প্রভাবের পরিবর্তন ঘটে গেছে। আধুনিক নগরায়িত সমাজের মানুষ আর অন্ধভাবে ধর্মকে অনুসরণ করতে চায় না; বরং সে তার যুগ ও কালের বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনচেতনায় সচেতন হয়ে ওঠে। তাই তার সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ধর্মীয় বিধান ও ঈশ্বরীয় নীতি-নির্দেশের নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা ঘটে।

সাধারণভাবে **ধর্মনিরপেক্ষতা** বা **Secularism** বলতে জাগতিক বিষয় এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের মধ্যেকার পৃথকীকরণকে বোঝায়। এ হল মানুষের জীবনধারার রাজনীতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে ধর্মীয় বিষয়াদিকে স্বতন্ত্র করার দিগদর্শন। পশ্চিমি ধারণা অনুসারে বা সংকীর্ণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা বা সাধারণ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা ও পৃথক রাখা বোঝায়। লিও ফিফার অভিমত অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা হল রাষ্ট্র থেকে গির্জাকে পৃথক রাখা।

বস্তুতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্মবাদের বিপরীত। নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি পেলে ধর্মবাদ হ্রাস পেতে থাকে। আগে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের অবিসংবাদিত নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকত। তবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি বলতে কিন্তু ধর্মহীন, অধার্মিক বা ধর্মবিরোধী রাজনীতিকে বোঝায় না। এইচ. ভি. কামাথ-এর অভিমত অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে দেবতাহীন রাষ্ট্র বা অধার্মিক রাষ্ট্র বা ধর্মবিরোধী রাষ্ট্রকে বোঝায় না, বরং বোঝায় ধর্ম ও ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাব সংযোগহীন বাস্তব রাষ্ট্রকেই।

➡ **ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বৈশিষ্ট্য :** ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রকৃতির প্রেক্ষাপটেএর কতগুলি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল যথা—

(i) ধর্মাশ্রয়ী কার্যকলাপের অবসানই হল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশের অর্থই হল রাজনৈতিক কার্যকলাপে ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার অবলুপ্তি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব হ্রাস পেলে তবেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশ ঘটে।

(ii) ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে ধর্ম ও ধর্মদর্শন থেকে রাজনীতির পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাজনীতির বিষয়াদি বিচার-বিবেচনা করা হয়, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়।

(iii) ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে ধর্মীয় বিশ্লেষণের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই গুরুত্ব লাভ করে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের রাজনৈতিক নেতাগণ রাজনীতির প্রশ্নে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে থাকেন।

(iv) যৌক্তিকতা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজনৈতিক বিষয়াদির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যুক্তির মানদণ্ডে যা অসঙ্গত প্রতিপন্ন হয় আধুনিক কালের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতিতে তা একেবারেই অচল বলে প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

মোটামুটিভাবে এই বিষয়গুলিই হল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

- **ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সহায়ক বিষয়সমূহ :** ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে কতগুলি বিষয়ের ইতিবাচক অবদান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সহায়ক বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;এগুলি হল যথা—

(i) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশের ব্যাপারে পশ্চিমি শিক্ষার বিস্তার বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। আধুনিক উন্নত পশ্চিমি শিক্ষাব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও বিস্তারে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে।

(ii) বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে, ধর্মান্ধ ধ্যানধারণার অবসান ঘটেছে এবং উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটেছে। এর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হয়েছে।

(iii) নগরায়নও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতর সহায়ক উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। মূলত শহরাঞ্চলেই ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় হয়। নগর সভ্যতার বিকাশই ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ধর্মান্ধতার বিনাশকে তরান্বিত করে থাকে।

(iv) শিল্পায়নও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকে পরিপূর্ণ করে তোলে। শিল্পায়নের ফলে নগরায়নের সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শহুরে সভ্যতারও বিকাশ ঘটে থাকে। শিল্পসংস্থাগুলিকে কেন্দ্র করেই নতুন নতুন বসতি গড়ে ওঠে। এর ফলে শিল্পসমৃদ্ধ শহরে রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা গড়ে ওঠে।

(v) ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক আন্দোলনও অনেকক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সহায়ক শক্তি হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

(vi) ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক উপাদান হিসাবে পাশ্চাত্ত্যীকরণের (Westernisation) উপস্থিতি। ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। সমাজজীবনের মতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্যীকরণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টভঙ্গিকে বিকশিত করে। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদের তাঁদের **An Introduction to Sociology** নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "The western culture lays emphasis on materialism, individualism, sensualism, nonreligionism, ..." অর্থাৎ "পশ্চিমি সংস্কৃতিই বস্তুবাদ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ভোগবাদ, অ-ধর্মবাদের...উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।"

(vii) আবার সহায়ক সাংবিধানিক ব্যবস্থাদিও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুকূল অবস্থা গড়ে তোলে। অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে ধর্মবিরোধী প্রচারের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। ভারতের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষ সহায়ক বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় সংবিধানের ২৫-২৮ নং ধারা, ১৪-১৭ নং ধারা, ২০(২) নং ধারা, ৩২৩ নং ধারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কারণ এই ধারাগুলিতে ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে ধর্মের ব্যাপারে উদার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

এভাবে পৃথিবীর অনেক দেশেই রাষ্ট্র থেকে ধর্ম ও গির্জাকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। আর এর ফলেই

পৃথিবী জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। এতদসত্ত্বেও একথা বলা যাবে না যে, ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, আজকের দিনের প্রবণতাই হল ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনা। আর এই ক্রমবিকাশমান প্রবণতার প্রেক্ষাপটে আজকের দিনের রাজনীতি অপেক্ষাকৃত ধর্মনিরপেক্ষ বা Secular হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

✦ **মন্তব্য :** সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আজকের দিনের রাজনীতির মৌলিক প্রবণতাই হল ধর্মনিরপেক্ষতার (Secularlism) অনুশীলন। মূলত ধর্ম, ধর্মদর্শন, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মীয় বিধান ও ঈশ্বরীয় আদেশ-নির্দেশের প্রভাব-মুক্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনীতিই হল ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরীয় অনুধ্যান, ধর্মীয় বিধান ও শাস্ত্রীয় আচারের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা লাভ করে থাকে। বস্তুত ইউরোপীয় নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পথ ধরেই রাজনীতির এই ধর্মনিরপেক্ষ সত্তার উন্মেষ ঘটেছে এবং তা আজকের দিনে যথেষ্ট বলিষ্ঠ রূপ লাভ করেছে। তাই আধুনিকীকৃত নগরায়িত, শিল্পায়িত, বিদ্যুদয়িত ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির চেতনাই এক রাজনৈতিক বাস্তবতা (Political reality) স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

18.14. ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Religion and Politics)

◆ **সূচনা** : মানুষের জীবনের দুটি বিশেষ দিক হল ধর্ম ও রাজনীতি। ধর্ম হল মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিকের পরিচালিকা শক্তি স্বরূপ। অন্যদিকে রাজনীতি হল মানুষের জীবনের পার্থিব দিক তথা বাস্তব রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দিকের নির্দেশক বিশেষ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিগত দিক থেকে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে।

◆ **ধর্ম** : সাধারণভাবে ধর্ম হল অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় শক্তি তথা অলৌকিক বা ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতি বিশ্বাস। মূলত অতীন্দ্রিয় বা ঈশ্বরীয় শক্তিকে বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করার প্রয়াসই হল ধর্ম।

◆ **রাজনীতি** : সাধারণভাবে রাজনীতি হল এক বাস্তব সামাজিক ক্রিয়া। মূলত সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের প্রয়াস হল রাজনীতি। তাই রাজনীতির মধ্য দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে।

◆ **ধর্ম ও রাজনীতি** : ধর্ম ও রাজনীতি—এই দুটি বিষয় পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে ও নিজেরা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিতও হয়। অথচ ধর্ম হল একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক জগতের বিষয়, তাই পার্থিব জগতের বিষয়াদির সঙ্গে ধর্মের কোনো স্বাভাবিক সংযোগ থাকার কথা নয়। ধার্মিক ব্যক্তিগণ নিজেদের রাজনীতি থেকে সযত্নে সরিয়ে রাখেন—এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক জগতের ধার্মিক মানুষও রাজনীতির স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ধার্মিক ব্যক্তিগণ রাজনৈতিক বিচারে নিরপেক্ষ প্রতিপন্ন হন—একথা ঠিক। কিন্তু রাজনৈতিক লাভের পথিক যারা, তারা আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণকে দূরে সরে থাকতে দেন না, বরং নানা কৌশলে তাদের (ধর্মপ্রাণ মানুষদের) রাজনৈতিকীকৃত করে ফেলতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ ধর্মানুরাগীগণের রাজনীতি-নিরপেক্ষ জীবনধারার মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাকে অনুপ্রবিষ্ট করেন। তাই ধর্মানুরাগীগণের পক্ষে রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে। যেমন জাতির দুর্দিনে বা দেশের সংকটে দেশবাসীর সকল অংশের সামগ্রিক সহযোগিতার জন্য তাদের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ধর্মানুরাগীগণও রাজনীতি- নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। আবার অনেক সময় ধর্মানুরাগীগণকে রাজনীতির প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বাইরে থাকতে দেওয়াও হয় না। অনুরূপভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আবার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহও ধর্মের দ্বারা স্বীকৃত, সমর্থিত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে। স্বভাবতই ধর্মপ্রাণ মানুষজন এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন।

➡ **ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্কের প্রেক্ষাপট** : ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্কের উৎস নিহিত রয়েছে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজব্যবস্থার মধ্যে। মধ্যযুগীয় ইউরোপে ছিল মূলত ধর্মাশ্রিত সমাজ। এই সমাজে ধর্ম ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের ছিল চূড়ান্ত প্রভাব। ধর্মীয় সংস্থা হিসাবে চার্চ বা গির্জার ছিল অখণ্ড আধিপত্য। গির্জার কর্তৃপক্ষ তথা পুরোহিত কর্তৃপক্ষ বা যাজকতন্ত্রই মধ্যযুগীয় ইউরোপের সমাজজীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। গির্জার কর্তৃপক্ষের আদেশ- নির্দেশেই মানুষের জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। দেশের শাসক হওয়া সত্ত্বেও রাজার রাজ্যশাসনের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না। রাজাকে যাজক সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে পোপের নির্দেশ মেনেই রাজ্য শাসন করতে হত। ফলে এই যুগে ধর্মই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই যুগে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে একাত্মতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

মার্টিন লুথার, স্যার রবার্ট ফিলমার প্রমুখ চিন্তাবিদও ঐশ্বরিক তত্ত্বের সমর্থক হিসাবে পরিচিত। ফিলমারও রাজার বিধি-দত্ত অধিকারকে সমর্থন করেছেন। রাজতন্ত্রকে তিনি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে, এই প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁর আরও অভিমত হল এই যে, রাজা এবং প্রজার সম্পর্ক হল পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। অধ্যাপক জনসন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, *"It is clear, then, that .... Ucho believed in the religion were thereby to some extent committed to support their Government"* অথবা এটা পরিষ্কার হয়ে ধর্মবিশ্বাসীগণও কিছু পরিমাণে তাদের সরকারকে বা (বা রাজনৈতিক পরিচালককে) সমর্থন করতে দায়বদ্ধ।

ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংযোগ ও সম্পর্কের বিষয়টি হল সুপ্রাচীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায়। ভারতে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয়রা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়। তারাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে রাজধর্ম পালন করে। আবার ভারতে হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার ও সমর্থন করা হয়ে থাকে। হিন্দুধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী শাসক জাতিই প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম অবশ্য বিপ্লব, বিদ্রোহ বা আন্দোলনকেও সমর্থন করে থাকে। এক্ষেত্রে অন্যতম উদাহরণ হিসাবে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সংস্কার আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য ধর্মীয় স্বার্থ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পিছনে অন্যতম কারণ হিসাবে সমকালীন ক্যাথলিক গির্জার বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়ার কথা জোরালোভাবে বলা হয়ে থাকে।

➡ **আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাজনীতি :** আধুনিককালেও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের অস্তিত্ব গভীরভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেকার গভীর সংযোগ-সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাতেই এই সংযোগ-সম্পর্ক বিশেষভাবে গড়ে উঠতে দেখা যায়। রাজনৈতিক জোট গঠন, নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা, মন্ত্রী পরিষদ গঠন, দপ্তর বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সংযোগ-সম্পর্কের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। বিশেষত করে ভারতের কেন্দ্র এবং রাজ্যের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিষয়াদির উপর ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য জোরালোভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণকে অভিন্ন দেওয়ানি আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বা করা যায়নি। আবার নির্বাচনী সাফল্যের পথটিকে মসৃণ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাগণকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয় গুরু বা আচার্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক মঠ, মন্দির ও মসজিদের মহন্ত ও মৌলানাগণের আশীর্বাদ ও সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। ধর্মীয় নেতাগণও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেন না। তাঁরাও রাজনৈতিক নেতাগণকে নিজেদের অনুগত করে রাখতেই সচেষ্ট থাকেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতাগণের আদেশ-নির্দেশেই সেই সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন ভোট দিতে উৎসাহ বোধ করে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাগণও ভোট-রাজনীতির স্বার্থে ধর্মীয় নেতাগণকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করতেই সচেষ্ট থাকেন।

তা ছাড়া ভারতবর্ষে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্কটি এতই গভীর যে এখানকার রাজনৈতিক

দলগুলির রাজনীতি অনেক সময় ধর্মীয় বিবেচনার দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই ডান-বাম নির্বিশেষে এখন সকল রাজনৈতিক দলই নির্বাচনী সাফল্যের স্বার্থে ধর্মের পরিচর্চা করে থাকে এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মের মানুষজনের প্রাধান্যসমৃদ্ধ এলাকাতে বিশেষ বিশেষ ধর্মের ব্যক্তিকেই প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে থাকে।

এভাবেই আধুনিক যুগে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সুগভীর একাত্মতা গড়ে উঠেছে।

✦ **মন্তব্য** : সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আজকের দিনেও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, বিদ্যুদয়ন ও আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও আজকের দিনে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক এক বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। বস্তুত আজকের দিনেও ধর্ম ও রাজনীতি— উভয়েই একে অপরকে প্রভাবিত ও প্রসারিত করে থাকে। ধর্মের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি যেমন বর্তমান দিনে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তেমনি রাজনীতির পক্ষপুটেও ধর্ম লালিত-পালিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে। তাইতো আজকের দিনেও ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যেকার সম্পর্ক সমানভাবেই বজায় রয়েছে। এটাই বাস্তব সত্য, সন্দেহ নেই।

18.15. ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা (Religion and Communalism in Indian Politics)

✦ **সূচনা** : অত্যুগ্র ধর্মীয় চেতনা বা সাম্প্রদায়িকতাই ভারতবর্ষের সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষে অসংখ্য জাত, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। এই ধর্মগুলির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হল হিন্দু ও ইসলাম। সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান জনগণ পাশাপাশি অবস্থান করলেও ব্রিটিশ শাসনে এদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতায় রূপ লাভ করে এবং সেই সাম্প্রদায়িকতা তথা উগ্র ধর্মীয় চেতনা এখনো ভারতের সমাজ-রাজনৈতিক জীবনে সমানভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

✦ **রাজনীতির ধর্মীয়করণ** : প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতার চেতনা ভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকে পরিণত হয়েছে। ফলে ধর্মের চেতনা ভারতীয় রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। তাই ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই কমবেশি ধর্মীয় চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং নির্বাচনের সময়ে ধর্মীয় বিবেচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে একত্রে বামপন্থী ও ডানপন্থী নির্বিশেষে সকল দলই ধর্মীয় বিবেচনার ভিত্তিতে নির্বাচনের কেন্দ্রগুলিতে প্রার্থী মনোনীত করে থাকে। এটাকেই **রাজনীতির ধর্মীয়করণ** (Religionisation of Politics) বলা যেতে পারে।

✦ **রাজনীতির ধর্মীয়করণের মূল কারণ** : ভারতীয় রাজনীতির এই ধর্মীয়করণের মূলে রয়েছে হিন্দু ও মুসলমানের উগ্র ধর্মীয় চেতনা তথা সাম্প্রদায়িকতা বোধ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু ও মুসলমান জনগণ কিন্তু সদ্‌ভাবের সঙ্গে একত্রে বসবাস করত। ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল এবং সেই কারণেই তাদের মধ্যে কিছু বিরোধও ছিল, কিন্তু তখনও তা সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেয়নি। তাই দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে যখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তখনও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজনই হাতে হাত মিলিয়ে বিট্রিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কারণ ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বিপন্ন করেছিল, যেহেতু উভয়ই ছিল ব্রিটিশ শক্তির চোখে সমানভাবেই অপরাধী।

✦ **জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন** : কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহকে কঠোরভাবে

দমন পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করে। কারণ তাদের ধারণা ছিল বিদ্রোহের প্রাথমিক দায়িত্ব মুসলমানগণের এবং বিদ্রোহটির নেতৃত্বও এসেছে মুসলমান জনগণের কাছ থেকেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পর থেকে, বিশেষ করে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতের মুসলমান জনগণ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। কারণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এবং এই কংগ্রেস ছিল মূলত একটি হিন্দু সংগঠন এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন মূলত হিন্দু ব্যক্তিবর্গ। তাই কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল হিন্দুদেরই আন্দোলন এবং এই আন্দোলনে মুসলমান জনগণ তেমনভাবে অংশীদার নয়। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের হিন্দু বিদ্বেষ নীতি এবার নতুন রূপ লাভ করে। তুলনায় মুসলমান জনগণের প্রতি এবার সরকারের কিছুটা সুনজর গড়ে ওঠে।

◆ **হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে বিভেদনীতি** : জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলাকালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একথা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল যে, ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যদি বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তার মাধ্যমে ভারতের জাতীয় সংহতি আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠবে। তখন তাদের পক্ষে ভারতের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অটুট রাখা সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই কারণে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে উদীয়মান ভারতের জাতীয়তাবাদের গতিকে রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার সবরকম দমননীতি প্রয়োগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষজনের মধ্যে বিভেদ, বিবাদ ও অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বীজ বপন করতে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ সরকার তার 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি' বা 'Divide and Rule Policy' কে কাজে লাগিয়ে হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের উগ্র ধর্মীয় চেতনা তথা সাম্প্রদায়িকতা বোধে উদবুদ্ধ করে।

◆ **মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব** : তবে একথা ঠিক যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উগ্র ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতা-বোধ গড়ে উঠলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবোধ অবশ্য অপেক্ষাকৃত জোরালো ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর পিছনে নানা সমাজ-অর্থ-রাজনৈতিক কারণ আছে।

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবোধের উদ্ভব মূলত স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের সম্প্রদায়-প্রিয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহান শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর জীবন সূচিত হয়েছিল। জীবনের এই প্রথম পর্বে তিনি হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার চেতনায় একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু-প্রধান জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় মুসলমানগণের অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিভেদকামী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের 'বিভক্ত করে শাসন করার নীতি' ('Divide and Rule Policy')-এর প্ররোচনা, যা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। ফলে স্যার সৈয়দ খান এবার বলতে শুরু করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থে কোনো মিল নেই, বরং আছে ঘোর বিরোধিতা। ভারতীয় মুসলমানগণের স্বার্থ দেখতে গিয়েই তিনি এবার ব্রিটিশের সহযোগিতায় আলিগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল মহামেডান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এভাবেই তার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবোধের সূচনা ঘটে।

◆ **হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও তার দায়ভার** : ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্যমুখী ভূমিকার দায়ও কোনো অংশে কম ছিল না। হিন্দু-প্রধান ভারতে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগণ তথাকথিত সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের মান-অভিমান ও ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কখনোই তেম

আন্তরিকভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দেখেনি। বরং ভারতে নিজেদের সংখ্যাগুরুত্বের উচ্চমন্য প্রবণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য তারা (মহাত্মা গান্ধিজির মতো কিছু ব্যতিক্রমী হিন্দু ব্যক্তির ব্যতিরেকে) ভারতীয় মুসলিম সমাজের উপর কখনো কখনো অসংগত আধিপত্যও বজায় রেখেছিল। তাদের এই হিন্দুত্বের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার উদগ্র প্রয়াসই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার রূপ লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই হিন্দুত্বের শ্লাঘা ও সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠত্বের চেতনাকে সংযত রেখে বীর সাভারকরের মতো নেতৃস্থানীয় হিন্দু ব্যক্তিবর্গ যদি ভারতীয় মুসলিম জনগণের প্রতি আরও ভ্রাতৃসুলভ আন্তরিকতা ও সহনশীলতা দেখাতে পারতেন, তাহলে হয়তো বিকাশমান মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা খুব একটা বেশি গতি ও পুষ্টি লাভ করতে পারত না। আর এদিক থেকেই ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ও প্রসারে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য চেতনাও সমানভাবেই দায়ভাগী।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান—ভারতের এই দুই সম্প্রদায়ের সেই অতীতের সাম্প্রদায়িকতাবোধের স্রোতধারা আজকের ভারতীয় রাজনীতিতেও সমান তালে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাই তো আজকের দিনেও প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নির্বাচনী সাফল্যের স্বার্থে ধর্মীয় বিচার- বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল দলের ভূমিকাই হল মোটামুটি সমান।

◆ **ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক তোষণ :** ভারতবর্ষে তাই দেখা যায় যে, মুসলমান জনগণ অধ্যুষিত অঞ্চলে এখনো প্রতিটি রাজনৈতিক দলই মুসলমান ব্যক্তিকেই প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করে। নির্বাচনে ব্যর্থতার আশংকায় সেখানে কোনো হিন্দু ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করতে কোনো দলই তেমন একটা সাহস করে না। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক তোষণ নীতি আজকের ভারতের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

◆ **মন্তব্য :** সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ধর্ম তথা সাম্প্রদায়িক চেতনাই ভারতীয় রাজনীতিকে আজকের দিনে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। ধর্মীয় বিচার-বিবেচনার দ্বারাই ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজনৈতিক দল তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। ফলে আজকের দিনে ভারতীয় 'রাজনীতির ধর্মীয়করণ' ('Religionisation of Politics') ঘটে গেছে। এভাবেই আজকের দিনে ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্ম ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

18.16. ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতা (Secularism Vs. Communalism in India)

◆ **সূচনা :** ভারতবর্ষ হল প্রধানত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ভারতবর্ষের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুযায়ী এখানে কোনো সরকারি ধর্মের অস্তিত্ব নেই। বরং এখানে সকল ধর্মই সমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবিধানিক গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে থাকে। সকল ধর্মের মানুষজনই এখানে সমান সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। এভাবেই ধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সহনশীলতার আদর্শের সার্থক অনুসরণের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু তবু এই ধরনের ধর্মসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে মাঝে মাঝেই ধর্মীয় বিভেদ-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে থাকে। এর ফলে ভারতীয়গণের মধ্যকার ধর্মীয় সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা ইচ্ছাকৃতভাবে বিপন্ন হয়। আর এর ফলেই ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম সাম্প্রদায়িকতার (Secularism Vs. Communalism) বিরোধ-বিতর্কটি ভারতবর্ষে চূড়ান্ত হয়ে ওঠে।

◆ **বিতর্কটির প্রেক্ষাপট :** ভারতবর্ষ হল মূলত বিভিন্ন ধর্মের মানুষজনের আবাসস্থল। এখানে

বিভিন্ন ধর্মের বিপুল সংখ্যক মানুষ (১২০ কোটিরও বেশি সংখ্যক মানুষ) বসবাস করে। মূলত তারা এখানে ধর্মীয় সহনশীলতা, ধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গেই পারস্পরিক সহাবস্থান করে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা সকলেই সমান সাংবিধানিক-রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। ভারতীয় সংবিধান তাদের মধ্যে সমতার আদর্শ বজায় রেখেছে এবং সংবিধান অনুযায়ী তারা সমানভাবেই যাবতীয় মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করে থাকে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতাই ভারতীয় জনগণের জীবনচর্চার মৌলিক আদর্শে পরিণত হয়েছে।

তবে ভারতীয়গণের অনুসৃত এই ধর্মীয় সহনশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যেও কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায়ই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় বিরোধ তথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। এখানে অযোধ্যার রামমন্দির বনাম বাবরি মসজিদ বিষয়ক ভ্রাতৃঘাতী বিরোধ সংঘটিত হয়েছে। আবার গোধরা স্টেশনে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করে হিন্দু করসেবকদের জীবন্ত অবস্থায় দাহকারী নিধন যজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে গুজরাটের মুসলিম তল্লাটে অবাধে মুসলমান জনগণকে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের (৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪) পরে দিল্লিতে শিখ নিধন-তাণ্ডব, ওড়িশার কেওনঝড়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর হত্যালীলা প্রভৃতি ঘটনা ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শটিকে অবলীলায় বিসর্জন দিয়ে ধর্মোন্মাদনাসূচক সাম্প্রদায়িকতাকেই প্ররোচিত করেছে। এভাবেই ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা উত্তরোত্তর প্রশ্রয় লাভ করে চলেছে।

◆ **ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা** : তবু ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি সংবিধান-গতভাবে প্রতিপালিত হয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের নতুন সংবিধান রচনার জন্য গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে গণ-পরিষদের খসড়া প্রণয়নকারী কমিটির (The Drafting committee) সভাপতি ড. বি. আর আম্বেদকার মন্তব্য করেন যে, "আমরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই।.... ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির অর্থ হল, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা করবে না এবং এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না।"

দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন মনে করেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ বলতে রাষ্ট্রকে ধর্ম-বিরোধী বলা হয় না, আবার কোনো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ সহানুভূতিশীল হওয়াকে বোঝায় না; বস্তুত 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটির অর্থ হল, রাষ্ট্রের কাছে সকল ধর্ম সমান গুরুত্ব পাবে। বিশেষ সুবিধাভোগী ধর্ম (Privileged Religion) বলতে কিছুই থাকবে না।

মহম্মদ আলি জিন্না প্রণীত দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের দ্বিবিভাজনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তদানিন্তন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও অন্য সকল ছোটোখাটো দলই ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটিকে অনুসরণ করেছে। গণপরিষদেও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল। সেই কারণে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' ('Secular') শব্দটি বিশেষভাবে সংযোজিত হয়েছে (৪২তম সংবিধান সংশোধন আইন, ১৯৭৬) এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে (২৫-২৮ নং ধারায়)। ভারতের রাষ্ট্রপতি, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রভৃতি গৌরবোজ্জ্বল পদে ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে উপবিষ্ট হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও ক্রিকেট দুনিয়া এবং ফিল্ম ও সংগীত দুনিয়াতেও মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জয়জয়কার আজকের ভারতে প্রবলভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে।

◆ **ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা** : ভারতবর্ষ হল সত্যি সত্যিই বহু ধর্মাবলম্বী মানুষজনের দেশ।

১৯৯১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৮৩ ভাগ হল হিন্দু, শতকরা ১১ ভাগ মানুষজন হল মুসলমান ও বাকি ৬ শতাংশে হল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষজন।

ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও বাস্তবে মৌলবাদের ভিত্তিতে এখানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ভারতের জাতীয় সংহতিকে মাঝে মধ্যেই বিপন্ন করে তোলে, যদিও পাকিস্তানের সিয়া-সুন্নী লড়াই ও ইংল্যান্ডে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টের মধ্যেকার সংঘর্ষ ভারতের তুলনায় অনেক বেশি বলেই প্রচারিত হয়ে থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা বলতে অবশ্য বোঝায় বিশেষ কোনো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, কিন্তু বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার বাস্তবানুগ অর্থ হল এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ, বিরাগ ও হিংসা। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমর তাঁর সাম্প্রদায়িকতা নামক রচনায় সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন— যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তার সদস্যগণের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধন করতে সচেষ্ট হয়, তখনই তাঁর এই ধরনের উগ্র সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মানসিকতাকে সাম্প্রদায়িকতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, গভীর প্রত্যয়যুক্ত ধর্মানুরাগ যখন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারকদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে যুক্তিহীনভাবে অন্য ধর্মকে হেয় করে ও আঘাত হানে, তখনই সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা তথা সাম্প্রদায়িক চেতনা।

একথা সত্য যে, ধর্মীয় চিন্তা হল খুবই অনুভূতিপ্রবণ। শুধুমাত্র ধর্মের নামেই এক শ্রেণিকে অন্য শ্রেণির মানুষের উপর ধর্মযুদ্ধের জেহাদের মাধ্যমে উত্তেজিত করে আক্রমণ করা হয় এবং দেশের ও জাতির সংহতির বিনষ্টি সাধন করা হয়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এক শ্রেণির মানুষ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করে তোলে এবং সাধারণ, অজ্ঞ ও দরিদ্র মানুষজনও কেমন যেন প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদের প্রাথমিক চাহিদার (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ইত্যাদির) কথা ভুলে গিয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষে মেতে ওঠে। এমত অবস্থায় ভারতের মতো সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত শান্তি ও সংহতির দেশটি ও তার এতকালের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সুদীর্ঘলালিত গৌরবোজ্জ্বল উদারনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রসঙ্গ-ক্রমে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বহু কষ্টে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মের নামে খুব সহজেই কিছু স্বার্থান্বেষী মৌলবাদী ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ৮০ দশকের পরবর্তী ভারতবর্ষে। এমনকি গত লোকসভা নির্বাচনগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল নির্বাচনের সর্বভারতীয় বিচার্য বিষয়। কোনো দল কতটা সাম্প্রদায়িক সেই আলোচনায় না গিয়েই বলা যায় যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতার সপক্ষে বিপক্ষে অথবা আরোপিত বিশেষণের উপর নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। স্বাধীনতার ৬৬ বছরের পরেও জাত-পাত ও সাম্প্রদায়িকতা ভারতের শরীরে এক দুষ্ট ক্ষত স্বরূপ হয়ে রয়েছে, যা নিরাময় করার জন্য কোনও রাজনৈতিক দলই আন্তরিকভাবে খুব একটা সচেষ্ট নয়।

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেকার পারস্পরিক বিরোধকে উস্কানি দেওয়াটাই সাম্প্রদায়িকতার মূলকথা। রবার্ট মেলসন এবং উলপের মতে, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ অস্তিত্বকে রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ করার অর্থ সাম্প্রদায়িকতা। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সুধাংশু দাসগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা হল ধর্ম থেকে রাজনীতি ও শিক্ষার পৃথকীকরণ কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা হল ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় কার্যকলাপের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করা এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক বিপজ্জনক কালো দিন। মৌলবাদী হিন্দু ধর্মান্ধরা রামমন্দির আন্দোলনের নামে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িকতার জোয়ার বইয়ে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ধর্ম ও রাজনীতিতে একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার সেদিন অসহায় দর্শক মাত্রে পরিণত হয়েও কার্যকরী ভূমিকা কিছু পালন করতে পারেনি।

আমরা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘিষ্ঠের ভোট লাভ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে এবং তার মাধ্যমে তাদের নিজেদের দলের সমর্থক করে তুলতে চেষ্টা করে থাকে। শুধু তাই না, এরই বিভিন্নভাবে সমর্থকদের ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে চলে থাকে। এ ব্যাপারে ডান-বাম সব দলই তুলনামূলক ভোটব্যাঙ্কনীতিতেই সমান।

ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সঠিকভাবে গৃহীত হলেও, বর্তমানে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ, গোষ্ঠীবদ্ধ ও ধর্মব্যবসায়ী নামে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার জন্য অনৈতিকভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে চলেছেন। ভারতের সংবিধান বিশেষজ্ঞ এম.এম. মনে করেন ভারতে ইতিবাচক ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জনে তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন, যেমন—

(১) ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ,

(২) গণমাধ্যমগুলির সহায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার ও

(৩) গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের হাত থেকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য এই ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ।

সরকারিভাবে উপরের তিনটি বা অন্তত তিনটিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হলে ভারতবর্ষ থেকে ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে কিছু পরিমাণে হলেও দূর করা যেতে পারে। তার সাথে সাথে একান্ত প্রয়োজন হল জনচেতনার প্রসার। মূলত শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে জনগণকে সাম্প্রদায়িকতার কুফল সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব হলে সজাগ-সচেতন জনগণই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসবে। তখনই ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা যথার্থই অর্থবহ হয়ে উঠবে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জাতিগঠনের পথে সাম্প্রদায়িকতাই হল সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রসার, নারীর জনশিক্ষার প্রসার, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সংস্কারের মাধ্যমে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করে দিতে পারলেই সমন্বয়ের বন্ধন গড়ে উঠবে এবং এই সমন্বয়ের বন্ধনেই হবে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের সূত্র স্থির হবে উপরন্তু আগামী দিনের ভারতবর্ষ সকল গুণে গুণান্বিত, সুস্থ ও সুন্দর সমাজের জোয়ারে পরিণত হয়ে উঠবে।

* **মন্তব্য** : সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতবর্ষের সমস্ত নাগরিক রাষ্ট্রীয় আদর্শ হলেও এখানে কিছু মানুষ মাঝেই ধর্মনিরপেক্ষতার ধর্মসহিষ্ণুতা ও ধর্মীয় সহনশীলতার মূল্যবোধ বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক চেতনা তথা সাম্প্রদায়িকতা মাঝে-মাঝেই উৎকট রূপ ধারণ করে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষের সুস্থ ও সুসংহত অস্তিত্বের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাকে কোনওভাবে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত হবে না, বরং আপামর ভারতবাসীকে পরধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে হবে আন্তরিকভাবে। একমাত্র তবেই ধর্মনিরপেক্ষ

শিক্ষার বিস্তার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জাগ্রত জনচেতনার। জনগণের সজাগ-সচেতন দৃষ্টিই সাম্প্রদায়িকতাকে বুঝতে পারে, ধর্মীয় অনাচার-কদাচারকে প্রতিহত করতে পারে এবং ধর্মীয় উদারতার প্রসার সাধন করতে পারে। তাই ভারতীয় জনগণকে এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে যে, স্বার্থসর্বস্ব রাজনীতি যেন ধর্মীয় তাস খেলে সাম্প্রদায়িকতার বেনোজলে তাদের ডুবিয়ে না দেয় এবং স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক দলগুলি যেন তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লগিয়ে যেন সাম্প্রদায়িকতার ঘোলা জলে রাজনৈতিক স্বার্থের মাছ ধরতে না পারে। ভারতীয় জনগণ এভাবে সজাগ-সচেতন হয়ে উঠতে পারলেই সাম্প্রদায়িকতাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। তখনই ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটি মহিমাময় হয়ে উঠতে পারবে এতে কোনো সংশয় নেই।